

নারীর ক্ষমতায়ন : উত্তর-পূর্বের প্রতিবাদী পটভূমিতে একক প্রতিবাদ

সুমনা বসু (দে)

সংক্ষেপিত : উত্তর-পূর্ব ভারত তথা সাত বোনেদের রাজ্য, (মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড) বহু জাতি, উপজাতি অধ্যুষিত; ভাষাগত, অঞ্চলগত বৈচিত্র্য যেমন প্রকৃতিতে, তেমনই সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। তাই কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট-এর আলোচনায় বেজিং এর নারী সম্মেলন (১৯৯৫) ও পরবর্তী সম্মেলনগুলিতে লিঙ্গবৈষম্য মুছে ফেলে সুস্থ সমাজ গঠনের অন্যতম শর্ত হিসাবে নারী-পুরুষের যৌথ অধিকার ও দায়িত্বের সুষ্ঠু রূপায়ণের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে উত্তর-পূর্ব ভারতের নারীদের অবস্থা আলোচনাযোগ্য হয়ে ওঠে। আপাতভাবে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে তুলনায় উত্তর-পূর্ব ভারতে নারীদের অবস্থান উন্নত মনে হলেও বাস্তব চিত্রটি এর বিপরীত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, জীবিকা, যোগাযোগহীনতা, নারী পাচার, মাদক চোরাচালান প্রভৃতির মানদণ্ডে উত্তর-পূর্বের মেয়েদের সার্বিক বিকাশের চিত্রটি একেবারেই উজ্জ্বল নয়। সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব শান্তির বাতাবরণে। কিন্তু উত্তর-পূর্বের অধিকাংশ রাজ্যই একাধিক বিপ্লব, বিক্ষোভে রক্তাক্ত; মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে পদে পদে। মণিপুরে রাষ্ট্রীয় আফস্পা আইনের অপব্যবহার জনজীবনে অনিশ্চয়তা বাড়িয়েছে আরও বেশি। বিগত কুড়ি বছরে নানা সময়ে মেয়েরা এই আইনের শিকার হয়েছে। মণিপুরের নারীরা চিরকালই আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন। একবিংশ শতকেও তাই হিংসার প্রেক্ষিতে অহিংস প্রতিবাদে অনশনকে হাতিয়ার করে ন্যায়, শান্তি ও ভালবাসার দাবি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এক নারী—যাঁর জীবন ও কার্য তাই বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। নারীর ক্ষমতায়নের ইতিহাস হল বহুরৈখিক, বহুমাত্রিক, বহুস্তরীয় ও বহুচর্চিত, যার অভিমুখ বহুধাভিত্তিকও বটে। তাই হিংসার প্রেক্ষিতে অহিংস প্রতিবাদের নিঃসঙ্গ মুখটি নারীর ক্ষমতায়নেরই দ্যোতক হয়ে ওঠে।

প্রধান শব্দ : লিঙ্গবৈষম্য, সুস্থ, অহিংস, বিপ্লব, নিরাপত্তা, নৈতিকতা, মানসিকতা, মণিপুর

উপস্থাপনা

উত্তর-পূর্ব ভারত তথা সাত বোনেদের রাজ্য, (মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড) বহু জাতি, উপজাতি অধ্যুষিত; ভাষাগত, অঞ্চলগত বৈচিত্র্য যেমন প্রকৃতিতে তেমনই সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। তাই কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট-এর আলোচনায় বেজিং এর নারী সম্মেলন (১৯৯৫) ও পরবর্তী সম্মেলনগুলিতে লিঙ্গবৈষম্য মুছে ফেলে সুস্থ সমাজ গঠনের অন্যতম শর্ত হিসাবে নারী-পুরুষের যৌথ অধিকার ও দায়িত্বের সুষ্ঠু রূপায়ণের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে উত্তর-পূর্ব ভারতের নারীদের অবস্থা আলোচনাযোগ্য হয়ে ওঠে। আপাতভাবে অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে

তুলনায় উত্তর-পূর্ব ভারতে নারীদের অবস্থান উন্নত মনে হলেও বাস্তব চিত্রটি এর বিপরীত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, জীবিকা, যোগাযোগহীনতা, নারী পাচার, মাদক চোরাচালান প্রভৃতির মানদণ্ডে উত্তর-পূর্বের মেয়েদের সার্বিক বিকাশের চিত্রটি একেবারেই উজ্জ্বল নয়। সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব শান্তির বাতাবরণে। কিন্তু উত্তর-পূর্বের অধিকাংশ রাজ্যই একাধিক বিপ্লব, বিক্ষোভে রক্তগর্ভ; মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়ে চলেছে পদে পদে। মণিপুরে রাষ্ট্রীয় আফস্পা আইনের অপব্যবহার জনজীবনে অনিশ্চয়তা বাড়িয়েছে আরও বেশি। বিগত কুড়ি বছরে নানা সময়ে মেয়েরা এই আইনের শিকার হয়েছে। মণিপুরের নারীরা চিরকালই আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন। একবিংশ শতকেও তাই হিংসার প্রেক্ষিতে অহিংস প্রতিবাদে অনশনকে হাতিয়ার করে ন্যায়, শান্তি ও ভালবাসার দাবি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এক নারী-যাঁর জীবন ও কার্য তাই বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। নারীর ক্ষমতায়নের ইতিহাস হল বহুইতিক, বহুমাত্রিক, বহুস্তরীয় ও বহুচর্চিত, যার অভিমুখ বহুধাবিভক্তও বটে। তাই হিংসার প্রেক্ষিতে অহিংস প্রতিবাদের নিঃসঙ্গ মুখটি নারীর ক্ষমতায়নেরই দ্যোতক হয়ে ওঠে।

ঘটনা এক :

“আমরা প্রস্তুত, আমাদের মারো, নগ্ন করো, ভায়েদের রক্ত আমাদের শরীর ঢেকে দেবে” - সময় ১৯ শে ডিসেম্বর, ২০১১; সারা পৃথিবী দেখল মিলিটারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য মামা খাদিগা নামক এক মহিলাকে প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে নগ্ন করে বর্বর অত্যাচার করল মিশরের মিলিটারি। তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেল বয়স্ক মহিলা। তাকেও রেহাই দিল না সেনারা। আপামর নারীসমাজের প্রতিবাদে মুখর মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠল কায়রোর রাস্তাতে ২০ ডিসেম্বর। মুখে তাদের উপরোক্ত শ্লোগান।

ঘটনা দুই :

“রেপ আস, কিল আস, টেক আওয়ার ফ্লেশ”- সময় ১১ জুলাই ২০০৮ সাল; মণিপুরের আধা সামরিক বাহিনী (আসাম রাইফেলস) ৩২ বছর বয়সী মনোরমা থাংজামকে গ্রেপ্তার করে পাশবিক অত্যাচার চালাল। পরদিন তার লাঞ্চিত মৃতদেহ পাওয়া গেল। মনোরমার মৃত্যুতে ক্ষোভে, ধ্রোখে বিপর্যস্ত মণিপুরী ইমা সমাজ প্রতিবাদ জানাল নগ্ন হয়ে বাহিনীর প্রধান কার্যালয় কাংড়া ফোর্টের সামনে। সাদা ব্যানারে লেখা হল “ইন্ডিয়ান আর্মি, রেপ আস” - শ্লোগান উঠল একই।

ঘটনা তিন :

২রা নভেম্বর, ২০০০ সাল; ইম্ফলের ১৫ কি.মি.র মধ্যে ছোট শহর ম্যালকম বাস স্টপে অপেক্ষারত দশজন সাধারণ মানুষকে জঙ্গী সন্দেহে হত্যা করল নিরাপত্তাবাহিনী। তার দিন কয়েকের মধ্যে প্রতিবাদে অনশনে বসলেন সাধারণ পরিবারের সাধারণ কন্যা — আজ সারা পৃথিবীর কাছে যার পরিচয় একজন সত্যগ্রহী, মণিপুরের লৌহমানবী ইরম শর্মিলা চানু।

চিত্রাঙ্গদার লীলাভূমি, পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকা সমৃদ্ধ মণিপুর, রাস সংস্কৃতি ও নৃত্যের মণিপুর,

হস্তশিল্পের মণিপুর আর ড্রাগ-হেরোইন-নারী পাচার-এইডস্ ও দুর্নীতির চক্রব্যূহে আবর্তিত মণিপুর— এক নজরে এই হল মণিপুর রাজ্য। রাজ্যের আয়তন ২২,৩২৭ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা ২৩,৮৮,৬৩৪। উৎপূর্ব ভারতে রাজ্যটির অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। এর উত্তর-পশ্চিমে আছে নাগাল্যান্ড, অসম ও মিজোরাম রাজ্য ও পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আছে মায়ানমার রাষ্ট্র। রাজ্যটি নয়টি জেলায় বিভক্ত ও ত্রিশটি জনজাতির মধ্যে উপত্যকাভূমিতে আছে মেইতেই, লই, যাইথিবি, ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুপ্রিয়া ও পাগান বা মুসলিম জনজাতি গোষ্ঠী ও বাকিরা পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থান করছে। মেইতেইরা রাজ্যের জনসংখ্যার ষাট শতাংশেরও বেশি। তারাই কুকি-চিনদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত। সর্বভারতীয় পার ক্যাপিটা ইনকাম এর তথ্য অনুযায়ী অর্থনৈতিকভাবে মণিপুর পিছিয়ে পড়া রাজ্য, তাই বেকারত্ব আর দারিদ্র্য এখানে ঘোচেনা।

বিষয়মুখ

মণিপুরের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। ১৮৯১ খ্রিঃ ইঙ্গ-মণিপুর যুদ্ধান্তে মণিপুর ব্রিটিশ অধীনস্থ হয়। ১৯৪৭ খ্রিঃ মহারাজা বোধচন্দ্র ও লর্ড মাউন্টব্যাটেন কৃত সংযুক্তি চুক্তির ফলে স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার লাভ করে, ১৯৪৮ খ্রিঃ সর্বজনীন ভোটাদিকারের ভিত্তিতে গোপন ব্যালটে নির্বাচন হয়, সাংবিধানিক প্রধান হন মহারাজা। ১৯৪৯ খ্রিঃ ১৫ই অক্টোবর মণিপুর সংযুক্তি চুক্তির দ্বারা স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত হলেও মন্ত্রীসভা অজ্ঞাতেই থাকে। ফলে জন্মলগ্ন থেকেই মণিপুর ভারতের সঙ্গে স্বাভাবিক সখে আবদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়। মণিপুরের রাজনৈতিক আন্দোলন অতঃপর দুটি ধারায় প্রবাহিত— একটি গান্ধীজীর সত্যগ্রহের ভিত্তিতে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা আর অপরটি তথাকথিত “ভারতীয় ঔপনিবেশিক শাসন” থেকে মণিপুরের স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলন। ১৯৭২ খ্রিঃ মণিপুর ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হবার পূর্ব পর্যন্ত তা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারাই শাসিত হতে থাকে।

ইরম শর্মিলা অনশনে যে নৈতিকতার জোর—তার শিকড়ের সন্ধান মেলে মণিপুরের ইতিহাসে; রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে কঠোর আন্দোলন চলতে থাকে, যার রূপকার মণিপুরের নুপী সমাজ আর এই নারী আন্দোলন শর্মিলার দৃঢ় মানসিকতা গড়ে উঠতে সাহায্য করে। ১৯৭২ খ্রিঃ ১৪ই মার্চ ইরম শর্মিলার জন্ম হয় ইম্ফলের নিকটস্থ এক গ্রামে। বাবা নন্দ সিং, মা সাখি দেবী। পিতামহী তোনসিজা দেবীর কাছে নারী আন্দোলনের বিবরণ শুনতে শুনতে তার বেড়ে ওঠা। পরবর্তীকালে হিউম্যান রাইটস্ অ্যালাট-এ যোগ দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর্বেই ঘটে ম্যালকম হত্যা। আফস্পা নামক কালা আইনকে দায়ী করে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে অনশনে ব্রতী হন ২৮ বছর বয়স্ক কবি শর্মিলা। পরিচয় হয় মেইরা পাইবি সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে—যাদের মূল গ্রথিত ঔপনিবেশিক শোষণ বিরোধী নারী যুদ্ধ বা নুপিলানের মধ্যে।

মণিপুরের সমাজ ও অর্থনীতিতে নারীদের এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। প্রাক ব্রিটিশ আমলে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য (ngai নামে পরিচিত) পরিচালনা বা রাজার কাছে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর প্রাণভিক্ষা

সংক্রান্ত বহু অনুরোধ ও দাবিপত্র রাজা কর্তৃক স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে নারীদের প্রতাপশালী ভূমিকা স্পষ্ট হয়। ১৯০৪ খ্রিঃ প্রথম নুপিলান বা নারীযুদ্ধ হয়। প্রচলিত বিচারব্যবস্থার পরিবর্তে ব্রিটিশ আনীত পাশ্চাত্য ব্যবস্থা মেনে নিতে নারাজ মণিপুরের মানুষজন। ক্রমবর্ধমান অশান্তির আওনে ঘটাহুতি ব্রিটিশ সরকারের অমানবিক আদেশ। বলপূর্বক শ্রমদান নীতির বিরোধিতায় দাখিল হয় পিটিশন। তা অগ্রাহ্য হলে হাজার হাজার মণিপুরী নারী শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হন—নেতৃত্ব দেন সানজাওবা দেবী, লেইসাংথেম কেথাবি, ধাবল্লী দেবী প্রমুখ। শেষ অবধি প্রবল প্রতিরোধে ব্রিটিশ সরকার অন্যায় আদেশ বাতিল করতে বাধ্য হয়।

১৯৩৯ খ্রিঃ দ্বিতীয় নুপিলান এর সূচনা হয় চালের মূল্যবৃদ্ধি ও মণিপুর থেকে চাল রপ্তানির বিরোধিতা করে। এক্ষেত্রে যে গণতান্ত্রিক সরকারের দাবি অস্পষ্ট ছিল তা পরে প্রজা সম্মেলনের বাম নেতা হিজম ইরবট সিং-এর নেতৃত্বে সুস্পষ্ট হতে থাকে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলারা এসে দরবার হলের বাইরে জমায়েত হলে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের চাপে মহারাজা শেষ অবধি ধানের মূল্যহ্রাস করেন। তাদের বহন করা বুননের সহায়ক টেম শান্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। নেতৃত্ব দেন ছাওবিতন দেবী। স্বাধীনতা-উত্তর মণিপুরে শান্তির লক্ষ্যে একাধিক নারী সংগঠন গড়ে ওঠে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মেইরা পাইবি সংগঠন যারা জ্বলন্ত টর্চ হাতে নিয়ে ন্যায়ের স্বপক্ষে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে সামিল হত। ১৯৭০ খ্রিঃ মহিলাদের উল্লেখযোগ্য “নিশাবনধ” আন্দোলন গড়ে ওঠে দেশীয় মদের অবাধ ছাড়পত্রের বিরুদ্ধে ও সেইসূত্রে অ্যালকোহল বিরোধিতা, রাত পাহারা, চোলাই-এর ঠেক-এ অগ্নিসংযোগ, ড্রাগ ও মদ্যপান নিবারণী প্রচেষ্টা ছাড়াও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্ন, মূল্যবৃদ্ধি, পণপ্রথা, গার্হস্থ্য হিংসা এবং যৌন হয়রানি নিয়ে আন্দোলন দানা বাঁধে। টুকরো টুকরো প্রতিবাদী আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ করার তাগিদ থেকে জন্ম নেয় “অল মণিপুর উইমেন’স সোস্যাল রিফরমেশন এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি” যার প্রথম প্রেসিডেন্ট চাওবি দেবী, সেক্রেটারি মোমন দেবী। ১৯৮০ খ্রিঃ পর থেকে একদিকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বৈরিতার ব্যাপক প্রভাব বৃদ্ধি আর অন্যদিকে ব্যাপক দমন-পীড়ন-কালাকানুনের মধ্য দিয়ে সরকারের মানবিক মুখের অপসূয়মানতা নারী আন্দোলনের অভিমুখকে পরিবর্তিত করে। সামরিক, আধা সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিবাদ- “নিশাবনধ” থেকে মেইরা পাইবি সংগঠনে পরিবর্তিত সদস্যদের অন্যতম কর্মসূচী হয়। গান্ধিজীর আদর্শে বিশ্বাসী ইরম শর্মিলাও মণিপুরী মেয়েদের অহিংস প্রতিবাদের ঐতিহ্য বহন করে অনশনকেই “আনলফুল ল” বাতিল করার একমাত্র পথ বলে অসীম দৃঢ়তায় গ্রহণ করেন।

আফসোস্য হল সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট) যা সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর হাতে যে কোন নাগরিককে গ্রেপ্তার করার এমন কি হত্যা করার অধিকার তুলে দিয়েছে। ব্রিটিশ আমলে আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ারস্) অর্ডিন্যান্স, ১৯৪২ নামক কুখ্যাত কালো অর্ডিন্যান্স-এর বিবর্তিত রূপ এটি। ১৯৫৮ খ্রিঃ পার্লামেন্টে পাশ হয় মূলত বিরুদ্ধাচরণকারী নাগাদের দমন করার উদ্দেশ্যে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পস্ট সংসদে এটি

উত্থাপন করেন। আইনটির মোট সাতটি ধারায় সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে কতিপয় ব্যক্তির উপর। পক্ষান্তরে সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সম্পূর্ণ আইনি অব্যাহতির পথ রয়েছে খোলা। বস্তুত আইনটির মারাত্মক দিক হল সংবিধানের ২১ নং ধারা, ৩২(১) নং ধারা এমন কি (ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট অন সিভিল এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল রাইটস) এর মতো আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে যাচ্ছে আফসোস। ১৯৫৮ খ্রিঃ অসমে নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন রুখতে এটি প্রথম প্রয়োগ হয়। পরে নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও মণিপুরে (১৯৮০ খ্রিঃ) ও ১৯৯০ খ্রিঃ থেকে কাশ্মীরে এই আইন বলবৎ রয়েছে। ২০০০ সালে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এইচ. সুরেশ এক রিপোর্টে আফসোসের ক্ষতিকারক দিকটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেন। ২০০৪ সালে মণিপুরে থাংজাম মনোরমার মৃত্যুতে-সৃষ্ট জীবন রেড্ডি কমিটি ৬ই জুনের রিপোর্টে আইন প্রত্যাহারের পরামর্শ দিলেও তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শান্তির অজুহাতে এই সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেন। নভেম্বর ২০০৬, নোবেলজয়ী ইরানী-সমাজকর্মী শিরিন ইবাদি শর্মিলার সমর্থনে মুখ খোলেন। (মেইনস্ট্রীম ১-৭ অক্টোবর, ২০১০, পৃ ৩০, প্রতিবেদনে মিসেস ইবাদির বক্তব্য উল্লিখিত।)

জানুয়ারি, ২০১৩ তে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশিত সন্তোষ হেগড়ে কমিশন এই আইনটির অত্যাচারী রূপের বর্ণনা করেছেন এভাবে- “a symbol of oppression, an object of hate and an instrument of discrimination and high-handedness”। ১৯৮০ খ্রিঃ পর থেকে সেনা অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে একাধিক মানবাধিকার সংস্থা-‘সি এল এ এইচ আর ও’, ‘সি ও সি ও ই’, ‘এন পি এন এইচ আর’, ‘সি ও এইচ আর’, ‘এম ই পি ডব্লু এ কে’, ‘এ এম এস ইউ’ প্রভৃতি। তবু রক্তাক্ত মণিপুরে শান্তির আওয়াজ অস্পষ্ট থেকে যায়। রিপোর্টে বলা হয় মণিপুরে বেঁচে থাকাটাই লটারি পাওয়ার মতো দুর্লভ (টেরেসা রহমান (২০০১), “মার্ভার ইন প্লেন সাইট”, তহেলকা ম্যাগাজিন, ভল্যুম ৬, ইস্যু ৩১)। উঠে আসে শুধু ২০০৯ সালেই ‘ফেক এনকাউন্টার’ এ মৃত ২৬০ জনের তথ্য (ইণ্ডিপেন্ডেন্ট সিটিজেনস ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট (২০০৯), ‘ডেমোক্রেসী এনকাউন্টারড’-রাইটস ভায়োলেশনস ইন মণিপুর, নিউদিল্লী : দিল্লী সলিডারিটি গ্রুপ)। প্রশ্ন জাগে ২৬/১১র ঘৃণ্য দোষী কাসভ যদি বিচার ব্যবস্থার সুযোগ লাভে বঞ্চিত না হয় তাহলে মণিপুরী যুবসমাজ (যদি বৈরিতার পথে হাঁটেও) কেন সে সুযোগ পাবেনা— তাদের ‘এলিমিনেট’ হতে হবে? সোমা চৌধুরী (২০০৯), ‘লাইফ ইন এ শ্যাডো’, তহেলকা ম্যাগাজিন, ভল্যুম ৬, ইস্যু ৩২)

কি অপরিসীম দৃঢ়তায় রাষ্ট্রের বধিরতার সঙ্গে লড়ে যাচ্ছেন ইরম শর্মিলা চানু! চোদ্দ বছরের অনশনের নৈতিক জোর, অভিপ্রায়ের শক্তি ও গভীরতা দেশবাসীকে শ্রদ্ধাবনত করে। কিন্তু কোথাও কি তাঁর রণনীতি কিছুটা ব্যক্তিগত থেকে যায় না? — যেখানে সমষ্টির শক্তি বা আবেগ বর্জিত শাণিত যুক্তির প্রয়োজনীয়তা আর একটু অনুভূত হয়। তবু যখন দেখা যাচ্ছে যে বিগত বছরগুলিতে বৃদ্ধ গান্ধীবাদী আন্না হাজারের অনশন ভারতজোড়া সমর্থন লাভে সক্ষম হয়েছে বা অরবিন্দ কেজরিওয়াল-এর ধুমকেতুর মতো উত্থান দিল্লীবাসীর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে, এমনকি সাম্প্রতিক আশা জাগিয়ে

মোদী সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তখন প্রচারের আলো না পাওয়া মণিপুরী গান্ধীবাদী ইরম শর্মিলা চানুর দশক ব্যাপী অনশন কি আড়ালেই থেকে যাবে? শর্মিলার ভাই ইরম সিংহজিৎ-এর অনুযোগে — (“দিদি মূল ভূখণ্ডের নেত্রী হলে এতদিনে আফস্পা উঠে যেত” (আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৪/৮/২০১১) — কি মহিলার প্রান্তিক অবস্থানের ছায়া পড়ে না? যদিও সমাজতান্ত্রিক আশিস নন্দী বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করছেন যে কোনো না কোনো ভাবে দুর্নীতির শিকার প্রায় সমস্ত নাগরিকই। তাই তাদের এতটা একাত্মতা। কিন্তু শর্মিলার অনশন সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে, বিশেষ কঠোর আইনের বিরুদ্ধে আর সে সম্পর্কে ভারতবাসী অনেকটাই অন্ধকারে। “তাই শর্মিলার আন্দোলন তাদের মনে কোনো অনুরণন তোলে না।”। “অনশন অপরাধ” এর আবর্ত থেকে কিছুতেই বেরোতে পারেন না শর্মিলা চানু। কিন্তু সময় এগিয়ে চলে — চেতনার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। শত বাধা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় নাগরিকের প্রতিবাদী সত্তা। চানুর সমর্থনে অনশনের দশক পূর্তিতে একাধিক মিটিং, মিছিল, পদযাত্রা, দেশ ও বিদেশ থেকে সমর্থন ও অভিনন্দনের বার্তা বয়। (আনন্দবাজার পত্রিকা ১০/১০/২০১১) শান্তির সপক্ষে তাঁর এই দৃঢ়তা দেশি বিদেশি একাধিক সম্মান এনে দেয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২০০৭-এ মানবাধিকার রক্ষায় গোয়াংজু পুরস্কার, ২০০৯এ মণিপুরে অহিংস আন্দোলনের জন্য “প্রথম মেইলান্মাপুরস্কার” বা ২০১০এ আই আই পি এম কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ টেগোর শান্তি পুরস্কার প্রভৃতি। শুধু সরকারের তরফ থেকে সামান্য কথা বলাটুকুও হয়ে ওঠে না চানুর সঙ্গে। ৩০৯ ধারায় ধৃত “অনশন অপরাধ” এর আবর্ত থেকে বের হওয়া হয় না শর্মিলার। বর্তমানে ন্যাসো গ্যাস্ট্রিক ইনটিউবেশনের মাধ্যমে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। সাম্প্রতিকে তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করার নির্দেশ হয়েছে ইন্সফল জেলা আদালতে। চানুর আইনজীবী খাইদেম মণির মতে “আন্দোলনের জন্য অনশন কখনওই আত্মহত্যার চেষ্টার সমার্থক হতে পারে না।” (আনন্দবাজার পত্রিকা ৬/৬/২০১৪)

উপসংহার

বিগত ইতিহাসের পাতায় চোখ মেললে দেখা যায় রাষ্ট্র ক্রমশই ক্ষুদ্র শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়—জনসাধারণের ইচ্ছা ও স্বপ্নের সঙ্গে রাষ্ট্রের ব্যবধান তৈরি হয়। (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩/১০/২০১১) জাতি সংঘর্ষে উত্তাল, অর্থনৈতিক অবরোধের জাঁতাকলে পিষ্ট, রাষ্ট্রীয় হিংসা-প্রতিহিংসার উত্তপ্ত বাতাবরণে ভারতের উঃ পূর্বাঞ্চলের সাত বোনের অন্যতম মণিপুর যখন ব্রহ্ম, সশস্ত্র পথে বৈরিতা নানা ধারা উপধারায় প্রবহমান, সেইসঙ্গে সীমান্ত পেরিয়ে আসা অস্ত্রের সহজলভ্যতা অবশ্যই ইন্ধনের কাজ করেছে। এই পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনীর প্রভূত ক্ষমতায়ন বিচ্ছিন্নতাকে রুখে দেশের ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে শেষ কথা—এমনটাই সহজ যুক্তিতে মনে করা হচ্ছে বা করানো হচ্ছে। কিন্তু সমস্যার গভীরে না গিয়ে তাকে দমন করার যে চেষ্টা, সরকারের অতি সামরিকীকরণ যখন সাধারণ নাগরিক জীবনের কাঙ্ক্ষিত শান্তি আনয়নে ব্যর্থ, রক্ষকের সাধু আবরণের আড়ালে উঁকি মারে ভক্ষকের রূপ—সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় মেলে উঃ-পূর্বাঞ্চলে সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীর দুর্নীতি, স্বৈচ্ছাচারিতা

ও অসততার ভুরি ভুরি উদাহরণ (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৬/১২/২০১১) তখনই মানুষের সহানুভূতি মেখে শর্মিলার প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগতমাত্র না থেকে প্রতীকে পরিণত হচ্ছে আর এই প্রেক্ষাপটে অহিংস পথে প্রতিবাদী একক শর্মিলা আজ আর প্রান্তিক মানুষ নন। তাঁর অস্ফুট প্রতিবাদ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে আঘাত হানছে সামাজিক মানুষের দায়বদ্ধতার কাছে। রবীন্দ্রনাথের নটীর পূজা নাট্যরূপে ইরম শর্মিলার অনুপ্রবেশ বোধহয় তারই ইঙ্গিত।

সহায়ক রচনাপঞ্জি :

গুহরায়, এস। ২০০৭। মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। কলকাতা : মিত্রম।
চ্যাটার্জী, এস. কে। ১৯৭৪। ক্রান্ত - জন কৃতিঃ দ্য ইন্দো-মঙ্গোলয়েড, দেয়ার কন্ট্রিবিউশন টু দ্য হিস্ট্রি এণ্ড কালচার অব ইণ্ডিয়া। ক্যালকাটা : দি এশিয়াটিক সোসাইটি।
প্যারট, জে। ২০০৫। উন্ডেড ল্যান্ড, পলিটিক্স এন্ড আইডেন্টিটি ইন মডার্ন মণিপুর। নিউদিল্লী : মিতাল পাবলিকেশন।
ফনজুবাম, টি। ১৯৯৩। ইম্পারজেন্সী মুভমেন্ট ইন নর্থ ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া। নিউদিল্লী : বিকাশ পাব্লিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড।
মেহরোত্রা, ডি. পি। ২০০৯। বার্গিং ব্রাইট : ইরম শর্মিলা এণ্ড দ্য স্ট্রাগল ফর পিস ইন মণিপুর। নিউদিল্লী : পেঙ্গুইন বুকস ইন্ডিয়া।
সারণ, ভি.আই.কে। ১৯৮০। ইন্ডিয়াস নর্থ-ইষ্ট ইন ফ্লেক্স। নিউদিল্লী : বিকাশ পাব্লিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড।
সিং, এন. জে। ২০০৫। রেভলিউশনারী মুভমেন্ট ইন মণিপুর। নিউদিল্লী : আকাংক্ষা পাব্লিশিং হাউস।
সিং, এন. এল। ১৯৯৮। দ্য আনকোয়াইট ভ্যালী। নিউদিল্লী : মিতাল পাবলিকেশন।

ঋণস্বীকার :

- ১। চৌধুরী, নীরজা। ২২/১/১৯৮৩। 'মণিপুর শোজ দ্য ওয়ে', দ্য স্টেটসম্যান। নিউদিল্লী।
- ২। মেইনস্ট্রীম ১-৭ অক্টোবর। ২০১০। প্রতিবেদনে মিসেস ইবাদের বক্তব্য উদ্ধৃতি। পৃ. ৩০।
- ৩। টেরেসা রহমান। ২০০১। 'মার্ডার ইন প্লেন সাইট', তহেলকা ম্যাগাজিন, ভল্যুম ৬, ইস্যু ৩১।
- ৪। ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনিজেনস ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট। ২০০৯। ডেমক্রেসী 'এনকাউন্টারড' : রাইটস ভায়োলেশনস ইন মণিপুর। নিউদিল্লী : দিল্লী সলিডারিটি গ্রুপ।
- ৫। চৌধুরী, সোমা। ২০০৯। 'লাইফ ইন এ শ্যাডো'। তহেলকা ম্যাগাজিন, ভল্যুম ৬, ইস্যু ৩২।
- ৬। আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪/৮/২০১১, ১০/১০/২০১১, ৬/৬/২০১৪, ১৩/১০/২০১১, ২৬/১২/২০১১।
- ৭। অ্যানুয়াল জার্নাল। ২০১০-১১। ভল্যুম ৪, উইমেন্স কলেজ, শিলচর।
- ৮। ঘোষ, নিত্যানন্দ। ২০০৫। 'হার না মানা অলঙ্কারের ভূমি'। ভট্টাচার্য, প্রদীপ (সম্পা.) একালের রক্তক্ষরবী, নং

- ২৮।

লেখক পরিচিতি :

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ
বঙ্কিম সরদার কলেজ, কলকাতা
E-mail : sumanabs45@gmail.com